সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র
তৃতীয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ›› নভেম্বর ২০১৭ ›› পাঁচ টাকা

প্র্যাকটিস!

মারামারি করা ভালো নহে, তথাপি আমরা বাল্যকালে মারামারি করিয়াছি। লাটিম, মার্বেল, ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলিতে গিয়া আমরা প্রত্যহ এই কর্মে লিপ্ত হইতাম। আমাদের কী দোষ? আমাদের কথা মান্য না করিলে তখন আমাদের আর কি-ই বা করিবার থাকে? দেখিলাম পরিস্কার আউট, অথচ আম্পায়ার নির্বিকার। মারামারি বাঁধিবে না? আমাদের পোস্টে বল ঢুকাইয়া, গোল বলিয়া *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ

বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে আনার সরকারি তৎপরতার অশনিসংকেত

"কুৎসা, চাপ ও হুমকি প্রদান করে প্রধান বিচারপতিকেই যেভাবে পদত্যাগে বাধ্য করানো হয়েছে তা বিচার বিভাগের অবশিষ্ট স্বাধীনতাকে ধ্বংস করবে, দেশে ফ্যাসিবাদের বিপদ বাড়িয়ে দেবে। বিচারবিভাগের অবশিষ্ট স্বাধীনতা খর্ব করে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণে সরকার ও সরকারি দলের সাম্প্রতিক তৎপরতা 'খুবই বিপজ্জনক অশনিসংকেত' এবং সরকারের এই অশুভ তৎপরতা গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ তথা সরকারের অনুগত প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়ে যাবারই এক স্বৈরতান্ত্রিক উদ্যোগ। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়কে কেন্দ্র করে প্রধান বিচারপতিকে প্রথমে ছুটিতে যেতে ও তারপর তাকে যেভাবে পদত্যাগে বাধ্য করা হল তা সরকারের চরম অসহিষ্ণু ও অগণতান্ত্রিক চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ।"

গত ১৩ নভেম্বর সকালে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও সিপিবি-বাসদের কেন্দ্রীয় সভায় নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় পূর্ণ আকারে প্রকাশের আগে থেকেই সরকার ও সরকারি দলের নীতিনির্ধারকেরা শালীনতার সকল সীমা লংঘন করে যেভাবে প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে কুৎসা, চরিত্রহনন, কথিত মামলার প্রস্তুতি, চাপ ও হুমকি প্রদান করে এসেছেন তাতে দেশবাসীর কাছে এখন স্পষ্ট হয়েছে যে প্রধান বিচাররপতিকে পদত্যাগে বাধ্য করানো হয়েছে। সরকারের এই তৎপরতা একদিকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় কুঠারাঘাত আর অন্যদিকে বিচারবিভাগের প্রতি মানুষের শেষ আস্থাটুকুকেও ধ্বংস করবে। বিচারবিভাগসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রকারান্তরে নির্বাহী *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

অক্টোবর বিপ্লব শততম বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি'র মহাসমাবেশ

দৃপ্ত পদক্ষেপ ও শাণিত শ্লোগানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকার

সারাদিনের কাজ শেষে যারা সেদিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটছিলেন বাসার উদ্দেশ্যে – কেউ পায়ে হেঁটে, কেউবা চঞ্চল দৃষ্টিতে বাসের জন্য অপেক্ষমাণ। হঠাৎ সবাই যেন পাথরের মূর্তির মতো দাড়িয়ে যায় – বিস্মিত দৃষ্টিতে অপলক চেয়ে দেখে চোখের সামনে মিছিল নয়, যেন চলমান রক্ত সমুদ্র। চলছে তো চলছেই যেন আর শেষই হবে না। জনৈক দু'জন পথচারী যেতে যেতে মন্তব্য করলেন, 'বামপন্থীদের এতো বড় মিছিল! বিশ্বাসই হতে চায় না।' প্রত্যুত্তরে আরেকজন বললো, 'সবাই মিলেছে বলেই সম্ভব হয়েছে। এই শক্তি নিয়ে যদি জনগণের সংকট নিরসনের দাবিতে আন্দোলন করতো!' এমনি বিস্ময় আর প্রত্যাশার জন্ম দিয়ে গত ৭ নভেম্বর পালিত হলো রুশ বিপ্লবের শততম বার্ষিকী। 'অক্টোবর বিপ্লব শততম বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি' আহুত কর্মসূচির এদিন ছিল সমাপনী সমাবেশ ও লালপতাকা মিছিল। নদী যেমন মোহনায় মিলিত হয় তেমনি বামপন্থী চিন্তায়-আদর্শে বিশ্বাসী মানুষের মোহনা ছিল সেদিন শহীদ মিনার। ফলে কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর পূর্বেই সমাবেশস্থল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উৎসুক মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। এরপর ধীরে ধীরে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বামপন্থীদলগুলোর মিছিল আসতে থাকে। কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে শহীদ মিনারের আঙিনা। বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষ, শ্রমিক-কৃষক, শিক্ষার্থী – কে আসেনি এই কাফেলায়?

এদেশে আজ মরে মরে বেঁচে আছে মানুষ। প্রতিদিন কত লাঞ্ছনা-অপমান সয়ে সয়ে ধুঁকে ধুঁকে জীবনের পথ চলছে। সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে মানুষ। পারিবারিক বন্ধন ভাঙার উপক্রম হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সংখ্যালঘু নিপীড়ন
কাঁদছে মানবতা, জয়ী হচ্ছে শাসকেরা

একটু পেছনে তাকাই

উত্তম বড়ুয়া নামে এক ব্যক্তির ফেসবুক একাউন্টে পবিত্র কাবা শরীফ অবমাননার ছবি দেখা গেছে এই অজুহাত তুলে ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার জেলার রামুর বৌদ্ধপল্লীতে হামলা করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায় যে, ছবিটা সে পোস্ট করেনি, কেউ তার একাউন্টে এই ছবি ট্যাগ করেছে। অথচ এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পরের দু'দিনে রামু, উখিয়া, পটিয়া ও টেকনাফের প্রায় ১৯ টি বৌদ্ধবিহার ও অর্ধশতাধিক বাড়িতে হামলা করা হয়, আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। উত্তম বড়ুয়া আজও নিখোঁজ। তার স্ত্রী এক বছর পর এলাকায় ফিরতে পেরেছেন। উত্তমের স্ত্রী বলে সরকারের ত্রাণও তার কপালে জুটেনি। উত্তমের মা পড়েছিলেন ভিটে আঁকড়ে। তার কপালে জুটেছিল অশ্রাব্য *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

পুঁজিবাদ বিশ্বাস করে মুনাফায়, সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করে মনুষ্যত্বে

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাব এই সমাবেশে আসার জন্য এবং লালপতাকা নিয়ে মিছিলে যুক্ত হবার জন্য। আমরা এখানে যে বিপ্লবের শতবর্ষের উদযাপন করছি, সে রকম বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। এই বিপ্লব মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর আগে এমন ঘটনা ঘটেনি।

১৭৮৯ সালে ফরাসি দেশে একটা বিপ্লব হয়েছিল। সেই বিপ্লবের মূল কথা ছিল স্বাধীনতা, *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বিপ্লব করতে হলে আমাদের তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

কমরেড সভাপতি এবং মঞ্চে উপবিষ্ট কমরেড এবং বন্ধুগণ, আজকে রুশ বিপ্লবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা এখানে সমাবেত হয়েছি।

একটা দেশে বিপ্লব কীভাবে হবে এই প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সময় সংক্ষিপ্ত বলে আমি কেবল এই বিষয়টার উপর আলোচনা করতে চাই। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে আমি এই আলোচনাটি করছি।

আমরা যে দেশে আছি সেই দেশটা *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

কাঁদছে মানবতা, জয়ী হচ্ছে শাসকেরা

(১ম পৃষ্ঠার পর) গালিগালাজ আর হাজতবাস।

এরপর ২০১৩ সালের ২ নভেম্বর। পাবনার সাঁথিয়া উপজেলা। এখানে দায়ী ব্যক্তির নাম রাজীব সাহা। পনের বছর বয়সের রাজীব সাহা দশম শ্রেণির ছাত্র। গুজব উঠল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে সে ফেসবুকে কটূক্তি করেছে। আবার বাড়ি ও মন্দিরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। রাজীব সাহা ফেসবুক ব্যবহার করত কিনা সে বিষয়ে তার সহপাঠীরা কিছু বলতে পারেননি। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বলেছিলেন, ব্যাপারটা পরিকল্পিত।

পরের ঘটনা ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে। একইভাবে ফেসবুকে কাবাশরীফ অবমাননার অজুহাত এবং উপজেলা সদরের হিন্দু বসতি ও মন্দিরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ। এবারের ঘটনার উৎস হিসেবে দেখানো হয় রসরাজ দাস নামের এক যুবককে। বলা হয়, তার ফেসবুক আইডি থেকে আপত্তিকর পোস্টগুলো করা হয়। রসরাজ দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

প্রত্যেকটি ঘটনায় একটি ব্যাপার স্পষ্ট – ঘটনার উৎস যাদের পোস্ট, কোনো ঘটনায়ই তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি। এবারও রংপুরের পাগলাপীরের ঠাকুরপাড়া গ্রামে যে ঘটনা ঘটে গেল, সেখানে টিটু রায় নামে এক ব্যক্তির ফেসবুক থেকে বিতর্কিত পোস্টের কথা বলা হয়েছে। অথচ আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের ভাষ্যমতে টিটু রায় নিরক্ষর। সে আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার-দেনা করে সাত বছর ধরে এলাকার বাইরে আছে। যে ফেসবুক একাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে তার নাম মুহাম্মদ টিটু। একাউন্টটি তিনমাস আগে করা। তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এটা একটা ফেইক একাউন্ট। একটা ফেইক একাউন্ট থেকে পোস্ট করা একটা স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে আবার আক্রমণ, মন্দির ও ঘরবাড়ি ভাঙচুর, আগুন লাগানো। এবারে ঘটনার সময় পুলিশের গুলিতে একজন মারা যান।

ঘটনাগুলোর মধ্যে কোনো মিল আছে কি?

ঘটনাগুলো যদি আমরা একটু খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করি তবে প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যে একটি সাধারণ মিল দেখতে পাব। সেটা হলো ঘটনা ঘটার পূর্বে একটা বড় সময় ধরে ঘটনার প্রস্তুতি চলা, একটু একটু করে এর তীব্রতা বৃদ্ধি এবং এই সময়ে প্রশাসন কিংবা আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা কিংবা জনপ্রতিনিধি কারোরই কোনো ভূমিকা না থাকা। রামু, সাঁথিয়া, নাসিরনগর কিংবা ঠাকুরপাড়ার ঘটনায় আমরা একই বিষয় দেখব। সবগুলো ঘটনার এই জায়গায় একটা মিল আছে। কোনো জায়গায় হয়তো মানুষ জড়ো হয়ে মিটিং করেছে, তারপর মিছিল নিয়ে এগিয়েছে। কোনো জায়গায় রাস্তা অবরোধ করে ছিল অনেকক্ষণ, তারপর এলাকায় হামলা করেছে। কোনো জায়গায় মাইকে ঘোষণা দিয়ে হামলা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রশাসন যে সময় পেয়েছে তাতে সে ধ্বংসযজ্ঞ সামলাতে পারতো। কিন্তু না প্রশাসন, না প্রভাবশালী নেতা, না জনপ্রতিনিধি – কেউই এগিয়ে আসেননি। ঘটনাকে বাধাহীনভাবে সংগঠিত হতে দিয়েছেন। প্রশ্ন ওঠে এ কাজ তারা করলেন কেন।

এই 'কেন' প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ?

আমরা কোনো কেস স্টাডিতে না গিয়ে (কারণ সেগুলো পত্র-পত্রিকায় বহুবার এসেছে)এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, প্রশাসন ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ ঘটনাগুলোকে পরিপক্ক হতে সময় দিয়েছে। উত্তেজনাকে ধীরে ধীরে আক্রোশে পরিণত হতে দিয়েছে। ঘটনা পরিণত না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসন ও প্রবল ক্ষমতাধর আওয়ামী লীগ অপেক্ষা করেছে। কিন্তু কেন?

হামলা-ভাঙচুর-জ্বালানো পোড়ানো-লুটপাট কিংবা মানুষের মৃত্যু – কোনোটাই দেশের শাসকগোষ্ঠীর কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। দেশের শাসনব্যবস্থাটা পুঁজিবাদী। এখানে শাসকরা আসেই পুঁজির নিরাপত্তা দেয়ার জন্য। মানুষের নিরাপত্তা তাদের ভাবনার বিষয় নয়। এক একটি মানুষ এখানে এক একটি ভোট। গোষ্ঠী মানে একটি ভোটার গোষ্ঠী। সাধারণভাবে রাষ্ট্র চালাতে কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপার থাকে। সেদিক থেকে পুলিশ কিংবা প্রশাসন কিছু কাজ প্রতিদিনই করে। কিন্তু এটি বিশেষ ব্যাপার। একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী আক্রান্ত। একটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উপর ধর্মপরিচয়ের কারণে সংঘটিত আক্রমণ তাদের চিন্তায় প্রভাব ফেলে, তাদের রাজনৈতিক সমর্থন ও সক্রিয়তায় তার ছাপ পড়ে। ফলে রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর বিবেচনার ব্যাপার এ নয় যে, বাড়িঘর পুড়লে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হলে অসহায় মানুষগুলো কোথায় দাঁড়াবে; বরং বিবেচ্য বিষয় এই যে, এ ঘটনা তাদের কোন পক্ষে নিয়ে যাবে। 'কেন' এর উত্তর এখানেই নিহিত।

ঘটনার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য

প্রত্যেকটি ঘটনায় সংখ্যালঘুদের অসহায়ত্ব, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে। দেশে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়ার কারণে এই অসহায়ত্ব, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা তাদেরকে আরও বেশি করে আওয়ামী লীগমুখি করেছে। এরকম ঘটনাগুলোর সাথে স্থানীয় ও জাতীয় কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী জড়িত থাকে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ঘটনায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও তাদের নির্দেশে চলা প্রশাসন ঘটনাপূর্ব অবস্থাকে পরিষ্ক করে তুলেন, ঘটনা সংঘটিত হওয়াকে নির্বিঘ্ন করেন এবং ঘটনার পর ত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভূত হন। এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী তখন পরবর্তী আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদেরকেই অবলম্বন করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিজেদের সংগঠিত প্রতিরোধ প্রায় নেই, নিজ সম্প্রদায়ের সম্পদশালী ও প্রভাবশালী লোকেরা ও কায়েমি স্বার্থের লোকেদের সাথে যুক্ত হয়ে ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফায়দা তুলতে ব্যস্ত কিংবা একেবারে নিশ্চুপ – এ অবস্থায় উপায়হীন হয়ে আওয়ামী লীগকেই আশ্রয় করেন তারা। আওয়ামী লীগ একদিকে তাদের ভোটব্যাঙ্ক নিশ্চিত করেন, অন্যদিকে ঘটনার ভয়াবহতা ও ঘটনা পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকার্যের ব্যাপক প্রচার দিয়ে মানবতার রাজমুকুট নিজের মাথায় সমুন্নত রাখেন। ঘটনার তদন্ত হওয়ার পূর্বেই বিএনপি-জামাতকে দায়ী করে নিজেদের বিরোধীপক্ষকে একেবারে কোণঠাসা করেন। এটা হলো ঘটনার রাজনৈতিক দিক।

এর একটা অর্থনৈতিক তাৎপর্যও আছে। দু'একটা খবর তুলে দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

১২ মে, ২০১৪, 'বিডি নিউজ ২৪ ডটকম' এর একটি সংবাদে বলা হয়েছে, ১১মে সন্ধ্যায় নওগাঁর নিয়ামতপুর সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি বজলুর রহমান নঈম এর নেতৃত্বে ১৮-২০টি মোটরসাইকেলসহ অর্ধশতাধিক যুবকের বাহিনী স্থানীয় মন্দিরে হামলা চালায়। সাবেক ইউপি সদস্য মহারাজপুর গ্রামের বসুদেব চন্দ্র বর্মন অভিযোগ করেন যে, শ্মশানের পুকুরসহ সম্পত্তির দখল নিতে আওয়ামী লীগের এ নেতা হামলা চালান।

২৩ মে, ২০১৪, যুগান্তর পত্রিকার একটি শিরোনাম ছিল- 'ছাতকে সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ।' সেখানে বলা হয়- ছাতকে একটি হিন্দু পরিবারের বসতবাড়ির জায়গা জোরপূর্বক দখল ও গাছ কেটে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অবৈধ দখলদারদের বাধা দেয়ায় জায়গার মালিক সমীরণ সরকার ও তার স্বজনদের হত্যার হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা।

২৮ মে, ২০১৪, প্রথম আলো পত্রিকায় '৪০ বিঘা জমি আওয়ামী লীগ নেতাদের দখলে' এই শিরোনামে একটি সংবাদ ছাপে যাতে বলা হয়- ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দুধসর গ্রামে একটি হিন্দু পরিবারের পাকা বাড়িসহ ৪০ বিঘা জমি দখল করে রেখেছেন আওয়ামী লীগের দুই নেতা। তাঁরা সহোদর। আর সম্পত্তি উদ্ধারের মামলা করে ভয়ে পালিয়ে রয়েছেন পরিবারটির দুই সহোদর। তাঁরা এখন একটি ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

এটি শুধু ২০১৪ সালের মে মাসের কয়েকটি সংবাদ। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর প্রতি বছরের প্রতি মাসের হিসাব করলে এ লেখা শেষ করা যাবে না।

এ নিয়ে ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। ঘটনাই কথা বলছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার পেছনে একটা অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত, জড়িত কায়েমি স্বার্থবাদীদের একটা বিরাট গোষ্ঠী। বেশিরভাগ জায়গায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের দলীয় পরিচয় হলো আওয়ামী লীগ। ফলে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা ও সহিংসতার প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় আওয়ামী লীগ। যদি তাই হয়, তাহলে এ ঘটনা ঘটতে না দেয়ার কী কারণ থাকতে পারে তাদের পক্ষ থেকে?

ঘটনায় যে আওয়ামী লীগ জড়িত, এটি প্রমাণিত হয়েছে একাধিকবার। রামুর ঘটনায় আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশ চার্জশিট দিয়েছে। পরবর্তী সময়েও বেশিরভাগ ঘটনায় তাদের নাম এসেছে। দেখা গেছে শুধু হামলা চলতে দেয়া নয়, ঘটনাকে উস্কানো ও আক্রমণেও আওয়ামী লীগ নেতারা জড়িত।

গুজব যখন সত্য থেকেও শক্তিশালী

ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার পরের দিন 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় সংবাদ ছাপান হলো – 'বাবরি মসজিদ ভাঙা হল, ঢাকায় হিন্দুদের খুশিতে মিষ্টি বিতরণ'। এখনকার সময়ে আর পত্রিকার দরকার হয় না। ফেসবুক সে জায়গা নিয়েছে। বলা যায় কাজটাকে আরও সহজ করেছে। এ সময়ের সবগুলো ঘটনায় আমরা এর ভূমিকাই দেখব। এ ধরনের পরিকল্পিত মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের পেছনে পরিকল্পিত উদ্দেশ্য থাকে। পরিকল্পনা আগেই প্রস্তুত থাকে। এরপর চলে উস্কানোর কাজ। সেটা একটা মাত্রায় উঠলে তবেই কার্যসিদ্ধি হয়। অন্য ধর্মের নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণের কথা কোনো ধর্মেই নেই। কিন্তু গুজব ধর্মের বাণীর চেয়েও শক্তিশালী। ধর্মরক্ষার জন্য ধর্মকেই তখন অগ্রাহ্য করে মানুষ। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে যায়। ধর্মের সাথে মানুষের আবেগ যুক্ত। আবেগের উপর আঘাতের কথা শুনে সে নিষ্ঠুর হয়। তখন যে আবেগ তাকে অনেক খারাপ কাজ হতে দূরে রাখতো সে আবেগই অন্ধতার দরুণ তাকে নিচে নামায়। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'হৃদয়াবেগ দুর্মূল্য বস্তু, কিন্তু চৈতন্যকে অন্ধ করে দাঁড়ালে এর চেয়ে বড় শত্রু আর নেই।'

গুজবের পেছনে মানুষ ছোটে কেন

মানুষ এই গুজবের পেছনে যে এভাবে ছোটে, শাসকশ্রেণি-সাম্প্রদায়িক শক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা যে এভাবে ব্যবহৃত হয় – এটা কি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়? এর কোনো ঐতিহাসিক-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কি নেই? ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এরকম ব্যাপার চাইলেই ঘটান যায় কি? তাহলে আমাদের দেশে কিংবা ভারত, পাকিস্তান, মিয়ানমারে ব্যাপারটা এমন কেন?

আমরা দেখব, দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে লড়েছিল। তখন বিভক্তির সুর উঠতে পারেনি। কারণ পাকিস্তানি প্রায় উপনিবেশিক শাসনে সবাই নিষ্পেষিত হচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক এ শোষণ লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তাদের ঐক্যবদ্ধ করলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম ভাল হয়নি। অথচ তা জরুরি ছিল। লড়াইয়ের প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধতার যে জায়গা করে দিয়েছিল সেটাকে ভিত্তি করে নিজেদের সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে কমিয়ে আনা যেত। সবরকম সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডুকতাকে পরাস্ত করা যেত। সে চর্চা দেশের মুক্তির সংগ্রামের সময় হলে স্বাধীন দেশে কথায় কথায় এমন কাণ্ড তৈরি করা যেত না। কিন্তু তা হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল পরাধীন দেশের উঠতি পুঁজিপতি শ্রেণি। দেশ স্বাধীন করার তাদেরও প্রয়োজন ছিল, আবার দেশের মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত গরীব মানুষদেরও ছিল। সকলের প্রয়োজন এক ছিল না। লড়াইয়ে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য এক ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা বুর্জোয়ারা বিপ্লবভীতির কারণে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত-মেহনতি শ্রমিক কৃষকরা সাংস্কৃতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হোক তা চায়নি। ফলে ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাতিগত বিদ্বেষের মনোভাব এই দেশে থেকে গেছে। এই বিদ্বেষপূর্ণ মন তাদের শোষণের অস্ত্র। নির্মম পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জনগণ যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে তার জন্য এই অস্ত্র সে সবসময়ই ধার দিয়ে রাখে। নিষ্পেষণ ও নিপীড়ণের আর সকল হাতিয়ারে মরিচা পড়তে পারে, কিন্তু এই হাতিয়ার সবসময়ই ঝকঝকে থাকে – কারণ এর ব্যবহার ও যত্ন দুই'ই বেশি।

আমাদের করণীয়

আজ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শুধু নয়, পাহাড়ের আদিবাসীরাও ভীষণ নিপীড়নের মধ্যে আছেন। সংখ্যালঘুদের থেকে তাদের অবস্থা আরও খারাপ, আক্রমণ আরও তীব্র, অসহায়ত্ব আরও বেশি। সংখ্যালঘু নিপীড়ন নিয়ে তাও খবর হয়, সচেতন মানুষ প্রতিবাদ করেন – পাহাড়ে এর দশগুণ বেশি তীব্র নির্যাতনে এর দশভাগের একভাগ প্রতিক্রিয়াও হয় না। তবে কারণ দু'য়েরই এক। কারণ এই পুঁজিবাদী সমাজ। ধর্মীয় কিংবা জাতিগত নিপীড়নের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, তার কারণ এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই আছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে পুঁজিবাদবিরোধী লড়াইয়ে শামিল হওয়া দরকার, তীব্র সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ঐক্যকে আরও দৃঢ় করা দরকার। পুঁজিবাদের এই ঝকঝকে অস্ত্রকে সম্পূর্ণ অকার্যকর করা যাবে এই পথেই।

মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে নতুন জীবন পেয়েছে মানুষ

পল রবসন

(বিশ্বখ্যাত গায়ক পল রবসন ছিলেন আমেরিকার অধিবাসী। এই মানুষটি বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে এবং শোষিত-নিপীড়িত মানুষের জীবন নিয়ে অসংখ্য প্রতিবাদী গান রচনা করেছেন।)

লোককথা, লোক সঙ্গীত মানব অভিজ্ঞতার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার। বহু বর্ণে রঞ্জিত ও প্রসারিত হয়ে এর মাধ্যমে সমসাময়িক বীরেরা আমাদের সামনে ধরা দেন। রাশিয়া, চীন বা আফ্রিকা – সবদেশের লোককথা, লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এ কথা একইভাবে প্রযোজ্য।

১৯৩৭ সালে মস্কোর আশপাশ থেকে শ্রমিক, কৃষক, শিল্পী ও যুবকেরা এসে জড়ো হয়েছিল বলশয় থিয়েটারে। তারা এসেছিল প্রতিভাময়ী তামারা খানুমের পরিচালনাধীন উজবেক ন্যাশনাল থিয়েটারের একটা অনুষ্ঠান দেখতে। আধুনিক ও প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রে ভর্তি বিশাল অর্কেস্ট্রা। মুসোরাস্কি, চাইকোভস্কি, প্রকোফিয়েভ, শোস্টাকোভিচ, ক্রেনিঘভ, গ্লিয়েরের সঙ্গীত ঐতিহ্যের সাথে উজবেকিস্তানের প্রাচীন সমৃদ্ধ সুরের অভূতপূর্ব মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে এই অর্কেস্ট্রায়।

হঠাৎ সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিয়ে উল্লাসে চিৎকার করতে শুরু করলো। দেখলাম সবার মুখে হাসি। শিশুরাও হাত নাড়ছিল। ডান দিকের একটা বক্সে দাঁড়িয়েছিলেন মহান স্ট্যালিন। মুখে হাসি। দর্শক ও শিল্পীদের তিনি হাত তালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন।

মনে পড়ছে, আমিও হাসি মুখে হাত নেড়েছিলাম। আমার চোখ দিয়ে নীরবে অশ্রুমালা ঝরে পড়ছিল। মনে হলো, এই সেই মানুষ যিনি সবাইকে জড়িয়ে ধরে আছেন। তার সহৃদয়তার উষ্ণতা যেন আমি অনুভব করতে পারছিলাম – এত দয়ালু! একটা নিরাপত্তার অনুভূতি যেন সারা দেহে বয়ে গেল। এখানে একজন আছেন যিনি জ্ঞানী ও যোগ্য। প্রতিদিন তার পথনির্দেশ লাভ করছে এটা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সৌভাগ্য। আমার ছেলে পাউলিকে উঁচু করে ধরলাম যাতে সে এই বিশ্ব নেতাকে অভিনন্দন জানাতে পারে। কারণ পল সোভিয়েতে মস্কো বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

অনিন্দ্যসুন্দর অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের পাওনা হলো একটা পরম আনন্দের অনুভূতি। কণ্ঠ বা বাদ্যযন্ত্রের একক বা সমবেত অনুষ্ঠান ছিল অভূতপূর্ব মৌলিক। চিরায়ত বা লোক নৃত্যের ক্ষেত্রেও একথা বলা চলে। কয়েক বছর আগে ১৯১০ বা ১৯১৫ সালে এটা কি সম্ভব হতো? তখন এরা ছিল অর্ধ ভূমিদাস। তাদের সংস্কৃতির প্রকাশ ছিল নিষিদ্ধ। জারের নির্যাতনের বুটের তলায় তাদের সুমহান ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছিল।

এখানে একজন দেখতে পাবেন বহিরঙ্গে জাতীয় কিন্তু মর্মবস্তুতে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির রূপ। এখানে এমন মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে যারা এশিয়া ও পূর্ব-পশ্চিম আফ্রিকার বাসুতো উপজাতির সাথে তুলনীয়। কিন্তু এখন তাদের জীবন বিশ বছর ধরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীন লেনিন-স্ট্যালিনের দক্ষ পরিচালনায় বিকশিত হচ্ছে। জাতীয় সংখ্যালঘুদের বিকাশের ক্ষেত্রে, গ্রেট রাশিয়ানদের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে স্ট্যালিন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন।

পরবর্তীকালে পিছিয়ে পড়া মানুষের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা নিজের চোখে দেখার জন্য আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। পশ্চিমে (ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পর্তুগাল, হল্যান্ড), আফ্রিকায় এশীয়দের এত পিছিয়ে পড়া বলে ধরে নেয়া হয় যে, বলা হয় শত শত বছর কেটে যাবে এইসব উপনিবেশগুলির আধুনিক সমাজের অঙ্গ হতে।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ইয়াকুৎস, নেনেৎসেস, কিরঘিজ, তাজিক প্রভৃতি উপজাতিদের মর্যাদা দেয়া, সাহায্য করা হয়। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক এই দেশে তারা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে। আমেরিকার নিগ্রোরা যা প্রতিদিন শুনে থাকে তেমন শূণ্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি নয় – মর্যাদা দেয়া হয় বাস্তবে। যেমন বলা যায়, উজবেকিস্তানের মরুভূমিকে তুলা উৎপাদনের শস্য শ্যামলা ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। আমার এক পুরোনো বন্ধু, মিস্টার গোল্ডেন, ট্যাক্সেগিতে কার্ভেরের অধীনে প্রশিক্ষিত হয়ে এই তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৪৯ সালে তাঁর মেয়েকে আমি দেখেছি। এখন বড় হয়ে গর্বিত সোভিয়েত নাগরিক হিসাবে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। আজ কোরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকায় কোটি কোটি নির্যাতিত ঔপেনিবেশিক মানুষ স্বাধীনতার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কী বীরত্ব, কী আত্মত্যাগ, কী দৃঢ়চিত্ততা! বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত যেন বিশ্রামের সময় নেই।

এদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে তথাকথিত মুক্ত পশ্চিমের সম্মিলিত শক্তি। নেতৃত্বে আছে আমেরিকার লোভী, মুনাফাখোর, যুদ্ধলোলুপ ও ধনকুবের গোষ্ঠী। আশু মুনাফার জন্য 'মার্কিন শতাব্দী'র মোহ তাদের অন্ধ করে রেখেছে। এই সত্য তারা দেখতে পায়নি যে সভ্যতা তাদের ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেছে – আমরা বাস করছি জনগণের শতাব্দীতে – ইউরোপের পূর্ব দিগন্তে এবং গোটা বিশ্বে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে উজ্জ্বল নক্ষত্র। পরাধীন দেশের মানুষ এখন তাকিয়ে আছে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দিকে । তারা দেখছে, তাদের মতো সাধারণ মানুষ মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে নতুন জীবন খুঁজে পেয়েছে। তারা দেখছে, সোভিয়েতের নেতৃত্বে ও সাহায্যের মাধ্যমে মাও সে তুং-এর নতুন চীন শক্তিশালী ও বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক জীবন ধারায় সুবিশাল বল সঞ্চার করেছে। তারা দেখছে, পূর্ব ইউরোপের পূর্বতন আধা ঔপনিবেশিক দেশগুলো জনগণের শক্তির উপর ভর করে, জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র তৈরি করে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করছে। বাস্তব ও তত্ত্বগত – উভয়ক্ষেত্রে তাদের মহাবন্ধু জোসেফ স্ট্যালিনের সুদক্ষ পরিচালনার ফলেই এই প্রগতি সম্ভব হয়েছে।

গল্পে গাথায় তাঁর প্রশস্তি তারা গেয়েছে, গাইছে এবং গাইবেও। স্ট্যালিন মহান। চিরকাল সবদেশেই তাঁর নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হবে। আধুনিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই স্ট্যালিনের প্রভাব বিস্তৃত ও গভীর। বিগত বছরগুলোর মতো তাঁর সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে লেখা দিকনির্দেশকারী সুসংহত শেষ রচনায় তিনি বিশ্ব সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে যে জ্ঞান রেখে গিয়েছেন তা আজও অমূল্য। শ্রদ্ধার সাথে একজন বলতেই পারে, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

হ্যাঁ, তাঁর গভীর মানবিকতা ও সুগভীর উপলব্ধির দ্বারা তিনি রেখে গিয়েছেন পর্বতমালা মূল্যবান ঐতিহ্য। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংগ্রামে পথনির্দেশ রেখে গিয়েছেন। তিনি আমাদের দেখিয়েছেন শান্তি, বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সম্পদের বন্ধুত্বপূর্ণ আদান-প্রদান, যুদ্ধ ও ধ্বংসের অবসানের পথ। নিরবিচ্ছিন্নভাবে, ধৈর্য ধরে হৃদয়বত্তা ও জ্ঞানের সাহায্যে শান্তি ও ক্রমবর্ধমান প্রাচুর্যের জন্য তিনি সংগ্রাম করে গিয়েছেন। দুঃখ ভারাক্রান্ত কোটি কোটি মানুষকে এই পৃথিবীতে রেখে তিনি চলে গেলেন।

কিন্তু তিনি জানতেন, সংগ্রাম চলবেই। তাঁর মহতী দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আসুন আমরা গর্বের সাথে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াই এবং শান্তি ও সবার জন্য আনন্দময় জীবনের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলি।

প্রগতিশীল সুরকার লুই অ্যালানের প্রেরণাদায়ী ভাষায় বলি,

"হে প্রিয় কমরেড, শপথ নিলাম

সংগ্রাম চলবে, সংগ্রাম চলবেই।"

প্র্যাকটিস!

(১ম পৃষ্ঠার পর) চিৎকার করিয়া প্রতিপক্ষ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে অথচ স্ট্রাইকার অফ সাইডে ছিল। মারামারি হইবে না? সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মারামারি একটু-আধটু করিতে হয়। তাহাতে ক্ষতি কী? ইহাতে সত্যের মর্যাদা কমিয়া যায় না, বরং মারামারির গৌরব বাড়ে।

গত কয়েকদিন যাবৎ শিক্ষকদের মারামারির সংবাদ পত্রিকার পাতায় আসিতেছে দেখিয়া অনেকে বুক চাপড়াইতেছেন। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই রচনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকদিগের গোষ্ঠী 'নীল দল' নামে পরিচিত। তাহারা কড়া আওয়ামী লীগ। সরকারি দলের ওয়ার্ড কমিটির নেতা গিয়াসউদ্দিন যেমন কথায় কথায় অন্যদের চাটি মারে, মারে 'সোনার বাংলা' গড়িয়া তোলার জন্যই, বুঝাইয়া তো আর দেশ গঠন করা যায় না - তেমনি শিক্ষকেরাও হাত তুলেন। গত কিছুদিন আগে সিনেট নির্বাচনের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদী মানববন্ধনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখাইয়াছেন। গিয়াসউদ্দিন দেখে নাই, দেখিলে লজ্জা পাইত।

এই সকল ব্যাপার নিয়া পত্রিকায় যত সমালোচনাই হউক, মানুষ যতই ছিঃ ছিঃ করুক, আমরা মনে করি 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত এই শিক্ষকদের দমিয়া যাইবার কোনো কারণ নাই। 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা সহজ নহে, আমরা জানি। ছোটবেলায় খেলার মাঠে সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া আমরা তাহা বুঝিয়াছি। শুধু বুঝাইয়া হয় না, পিটাইতে হয়। তার উপরে 'সোনার বাংলা'! না পুড়িলে খাঁটি সোনা কীভাবে হইবে? জনগণকে প্রথমে তাই পুড়াইতে হইবে।

কথা মনে হয় আমরা বেশি বলিয়া ফেলিতেছি। একটু ইমোশোনাল হইয়া পড়িয়াছি বোধ হয়। কেন হইব না? সরকারের মহৎ উদ্দেশ্য কেহই ধরিতে পারিতেছে না। দেখিয়া হৃদয়ে খুব চোট পাইতেছি। দেশটা বোঝার মতো কেহ নাই।

যাহা হউক প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি। বলিতেছিলাম নীল দলের কথা। তাহারা ছাত্র পিটাইয়াছেন, ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করিয়াছেন – ঠিক করিয়াছেন। করিয়াছেন এক মহান উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া। আমাদের পরিচিত এক চলচ্চিত্র পরিচালক বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ধারণকৃত ওইদিনের ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করিয়াছেন। বলিলাম 'কী করিবেন?' বলিলেন, 'সিনেমা বানাইব।' কী নাম দিবেন? তিনি দরাজ গলায় বলিলেন, 'এবার তোরা ছাত্রলীগ হ' । আমি বলিলাম, 'নামটা পরিচিত শোনাইতেছে।' তিনি বলিলেন, 'নামটা পরিচিত লাগিতে পারে, তবে কাজটা নিশ্চয় আপনার পরিচিত মনে হয় নাই?' আমি বলিলাম, 'না'। তিনি জবাব দিলেন, 'একেবারে ইউনিক!'

এই নীল দলের শিক্ষকেরা পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছেন। পত্রিকায় খবর দেখিয়া আমরা একটু চিন্তায় পড়িয়া গিয়াছিলাম। পরিচালক বন্ধু ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন। 'প্র্যাকটিস, বুঝিলেন প্র্যাকটিস। তাহারা প্র্যাকটিস করিতেছিলেন। মারধর প্র্যাকটিস করিতে হয় না? ইহাকেই পত্রিকাওয়ালারা না বুঝিয়া মারামারি বলিয়া প্রচার দিতেছে।'

এই ভুল প্রচার করিয়া সরকার মহোদয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা উচিত নহে। লিখিয়া দিলেন 'অমুক কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ।' কেন, তাহারা প্র্যাকটিস করিতে পারে না? দামাল ছেলেরা একসাথে থাকিলে একটু আধটু টাই টুই হয়-ই। তাহাতে এত প্রচারের কী আছে? তাহারা যে কত কত ভালো ক্রিয়া করে তাহা কি লেখা হয়?

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা আওয়ামী লীগের কমিটিতে আছেন বলিয়া সমালোচনা শুরু হইয়া গেল। কেন? ওরকম প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড দলের কমিটিতে কি লোকেরা থাকিতে চাইবে না? ইহা তো গৌরবের ব্যাপার। আজ যদি আইনস্টাইন বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে তিনি নিশ্চয় আমাদের প্রাণপ্রিয় দলের বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক হইতে চাহিতেন। দুঃখের ব্যাপার, তিনি বাঁচিয়া নাই। স্টিফেন হকিংও হাঁটাচলা করিতে পারেন না। গোটা দুনিয়ায় আজ জ্ঞানী লোকের অভাব। তাই যাহার যা মনে আসিতেছে বলিতেছে।

মন আজ কয়েকদিন যাবৎ খুবই ভারাক্রান্ত। এই পোড়া দেশের উন্নয়নের জন্য এত চেষ্টা, তাহা কাহারও চোখে পড়িতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা লেখাপড়া শিক্ষা শেষ করিয়া এখন ফাইটিং শিখিতেছেন। ইহা কি সিনেমার হিরো হইবার জন্য? দেশ গড়িয়া তোলার জন্য এত কষ্ট, এত পরিশ্রমের মূল্য কি কেহই দিবে না?

গাল বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। এই ব্যথা কে বুঝিবে? আর কত পিটাইলে বুঝিবে?

অক্টোবর বিপ্লবের শততম বার্ষিকী উদযাপন

(১ম পৃষ্ঠার পর) নেই স্নেহ-প্রীতির ছোঁয়া। স্বামী স্ত্রীকে খুন করছে, স্ত্রী ভাড়াটে খুনি দিয়ে হত্যা করছে স্বামীকে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ-হত্যা তো নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। যুবক-তরুণ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, কাজের নিশ্চয়তা নেই। ফলে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের যুক্ততা বাড়ছে। পরিবারে ভালবাসা নেই, রাষ্ট্রে সম্মান নেই, যোগ্যতার কদর নেই। এই অবস্থা থেকে মুক্তির কথা অনুসৃত হলো মহাসমাবেশে আসা বক্তাদের মুখ থেকে।

বক্তরা তাদের কথায় স্মরণ করলেন ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর (পুরনো ক্যালেন্ডারে ২৫ অক্টোবর) ঘটে যাওয়া মহান নভেম্বর বিপ্লবের কথা। যে বিপ্লব মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বুকে সংগঠিত হয়েছিল। নতুন সমাজ, নতুন সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটেছিল। তাই দেখে আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলেছিলেন, "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে জীবন যাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত।...রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যার

সমাধান করবার চেষ্টা চলছে।" বাস্তবিকই এই নতুন সমাজে 'সভ্যতার পাজর থেকে ব্যক্তিস্বার্থের বীজ' উপরে ফেলার মাধ্যমে সমাজের সমস্ত মানুষের কল্যাণের চিন্তাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। মানবিক বিকাশের সমস্ত রাস্তা অবারিত করা হয়েছিল। দাসত্ব থেকে নারীকে মুক্তি দিয়ে বিশ্বলোকের সামনে মানুষ হিসেবে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিল। সবার জন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কাজ-বাসস্থানসহ মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করেছিল। এক কথায় শতাব্দী থেকে শতাব্দী মানুষের উপর মানুষের যে শোষণ-নিপীড়ন-সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ-যুদ্ধ-হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ – সেই কলুষ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষকে মুক্ত করেছিল নভেম্বর বিপ্লব। একই সাথে দুনিয়াজোড়া যারা এই মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত – তাদেরও পথ দেখিয়েছিল। নভেম্বর বিপ্লবের সেই চেতনাকে ধারণ করেই এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বেগবান করার লক্ষ্যে উদ্‌যাপিত হলো শততম বার্ষিকী।

ঘড়ির কাঁটায় বেলা তিনটা বাজার আগেই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মহাসমাবেশের কাজ শুরু হয়। 'অক্টোবর বিপ্লব শততম বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি'র ব্যানারে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক। সূচনা বক্তব্য রাখেন উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাসদ(মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক মুবিনুল

হায়দার চৌধুরী, সিপিবি'র সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন নান্নু, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, জাতীয় গণফ্রন্টের টিপু বিশ্বাস, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, গণমুক্তি আন্দোলনের নাসিরউদ্দিন আহমেদ নাসু, গরীব মুক্তি আন্দোলনের শামসুজ্জামান মিলন, বাসদ(মাহবুব)-র শওকত হোসেন। বক্তব্য শেষে নগরীর রাজপথে উত্তাল ঢেউ তুলে বিশাল লালপতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। দৃপ্ত পদক্ষেপ, শাণিত শ্লোগানে এদেশের বুকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন হাজার হাজার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ।

অজেয় লিপি

বার্টোল্ট ব্রেখট

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়
সান কার্লোর ইতালিয় জেলখানার একটি কুঠুরিতে
আটক সৈনিক, মাতাল আর চোরদের সঙ্গে
ছিল এক সমাজতন্ত্রী সৈনিক
রঙ্গিন পেন্সিল দিয়ে ঘরের দেওয়ালে সে লিখে বসল হঠাৎ ঃ
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
ছোট্ট কুঠুরির আলো-আঁধারিতে দেখা যায় কী যায় না
বড় বড় কয়েকটা হরফ।
কারারক্ষকের দল যখন দেখল লেখাটা
ওরা পাঠিয়ে দিল এক বালতি চুনসহ একজন চিত্রীকে,
ছোট্ট বালতি তুলি দিয়ে সে চুনকাম করে দিল
ভয়ংকর ওই লিপির ওপর
কিন্তু শুধু হরফগুলোর উপর চুনকাম করায়
কুঠুরির দেওয়ালে চুনের অক্ষর ফুটে উঠল এখন ঃ
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।

অতএব এল দ্বিতীয় চিত্রী, চওড়া তুলিতে সারা দেওয়ালটাই
চুনকাম করে দিল সে
ফলে কয়েক ঘন্টা চাপা রইল লেখাটা, ফের সকাল বেলায়
চুন শুকোতে লিপিটা ফুটে উঠল জ্বলজ্বল করে ঃ
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
কারারক্ষকরা এবার পাঠাল ছুরি-হাতে এক রাজমিস্ত্রিকে
দেওয়াললিপির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায়।
ঘন্টাখানেক ধরে একটি একটি করে অক্ষর
চেঁছে তুলল মিস্ত্রি।
কাজ শেষ হল যখন, দেখা গেল কুঠুরির দেওয়ালে বর্ণহীন,
তবু গভীরভাবে খোদায় করা রয়েছে অজেয় লিপি ঃ
লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।
সৈনিকের মন্তব্য ঃ এবার দেওয়ালটাকেই উড়িয়ে দাও।

অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ

(১ম পৃষ্ঠার পর) বিভাগের অধীনস্ত করবার এসব পদক্ষেপ দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন ও তার বিপদ কেবল আরো বাড়িয়ে দেবে। সভায় নেতৃবৃন্দ সরকারের এসব অগণতান্ত্রিক তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

সিপিবি'র সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের সভাপতিত্বে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, বাসদের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু।

১০ টাকা দরে ওএমএস'র চালের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

১০ টাকা কেজি দরে ওএমএস'র চাল বিক্রয় ও চালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধসহ জনজীবনের সংকট নিরসনের দাবিতে গত ৩০ অক্টোবর রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল শেষে স্থানীয় প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য পলাশ কান্তি নাগ, আহসানুল আরেফিন তিতু, রোকনুজ্জামান রোকন প্রমুখ।

বক্তারা ১০ টাকা কেজি দরে ওএমএস'র চাল বিক্রয়, প্রতি পরিবারে অন্তত একজনের চাকুরি, ৮০০ টাকায় (৪ জনের পরিবার) সারা মাসের রেশন, খাদ্যদ্রব্যের সকল ব্যবসায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ, মজুতদারি ও কালোবাজারি বন্ধ, বিদ্যুৎ-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স বৃদ্ধি বন্ধ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, সকল এনজিও ও ব্যাংক ঋণ মওকুফ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বেসরকারীকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ, নারী-শিশু নির্যাতন ও ধর্ষণের বিচার, মাদক-জুয়া-অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, সকল ক্ষেত্রে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ, গুম-খুন-বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ দাবি করেন।

ঁজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোতে অনার্স ৩য় বর্ষের ফল প্রকাশের জটিলতা নিরসন ও পূর্বের নিয়ম বহাল রাখার দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ

নোয়াখালীতে ধর্ষক ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রেফতারের দাবিতে নারীমুক্তি কেন্দ্রের প্রতিবাদ

নোয়াখালীতে বিচারপ্রার্থী নারীকে ধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত সুবর্ণচর উপজেলার ২ নম্বর চরবাটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হোসেনকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে মানববন্ধন-সমাবেশ হয়েছে। গত ১৩ নভেম্বর বেলা সাড়ে ১১টায় জেলা শহরের টাউন হল মোড়ে প্রধান সড়কের পাশে এ কর্মসূচি পালন করে বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্র জেলা শাখা।

মানববন্ধন-সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সংগঠক স্বর্ণালী আচার্য্য। এ সময় বক্তব্য রাখেন, বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সদস্য তারকেশ্বর দেবনাথ, নারী মুক্তি কেন্দ্রের সংগঠক মুনতাহার প্রীতি প্রমুখ।

সোভিয়েত বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের লাল পতাকা র‍্যালি ও আলোচনা সভা

মহান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে গত ২০ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ১১টায় বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে লাল পতাকা র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রেসক্লাব চত্বর থেকে লাল পতাকা র‍্যালি নগরীর প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে নিউক্রস রোডস্থ সুমি কমিউনিটি কেয়ারে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক পলাশ কান্তি নাগের সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য সুবাস চন্দ্র রায়, শফিকুল ইসলাম, সবুজ হাসান সাগর, সংগঠক আজিজ মিয়া প্রমুখ।

চাল,ডাল, পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ

বাজারে আগুন জ্বলছে। অথচ এই সরকার সাধারণ মানুষের কথা না ভেবে মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে চলছে। পত্রিকায় খবর এসেছে সরকার গ্যাস- বিদ্যুতের দাম আবার বাড়াবে। এতে আনুষাঙ্গিক সকল খরচ বাড়বে এবং জনগণ আরও দুর্ভোগে নিপতিত হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ সমস্ত প্রকার মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ ও মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের শাস্তির দাবিতে ১৩ নভেম্বর বিকেলে বাসদ (মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্যপরচিালনা কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী এবং পরিচালনা করেন কার্যপরচিালনা কমিটির সদস্য কমরেড ফখরুদ্দিন

কৃষি জমি রক্ষায় জয়পুরহাটে বিক্ষোভ

জয়পুরহাট উপজেলার তুলশীগঙ্গা ইউনিয়নে অর্থনৈতিক জোনের নামে তিন হাজার বিঘা উর্বর ফসলি কৃষি জমি অধিগ্রহণ করে হাজার হাজার কৃষককে ধ্বংস ও সর্বস্বান্ত করার যে চক্রান্ত চলছে তার প্রতিবাদে ৫ নভেম্বর বেলা ১১টায় মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) জয়পুরহাট জেলা শাখার সমন্বয়ক কমরেড ওবায়দুল্লাহ মুসা ও কৃষি জমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে পীরগাছা উপজেলার আরাজী ঝিনিয়ায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পাঠাগার প্রাঙ্গণে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাগ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পাঠাগারের উপদেষ্টা পীযূষ কান্তি বর্মণ, শিক্ষক তাপস চন্দ্র সাহা, সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা, সদস্য আবু রায়হান।

ইয়েমেনে দুর্ভিক্ষ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) পৌঁছাতে না পারলে দেশটিতে ৭০ লাখের বেশি মানুষ না খেতে পেরে মরবে।

ইয়েমেনের এই পরিস্থিতি কয়েকটি বিষয় গভীরভাবে দেখার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। যারা বলেন সৌদি আরবে ইসলামী শাসন আছে, কিংবা ইসলামী শাসনেই মানুষের মুক্তি মেলে – তারা সৌদি আরবের আজকের ভূমিকাকে কীভাবে দেখবেন? যে কাবা শরীফ সৌদি আরবে, যেখানে সারা বিশ্বের মুসলমান জনগোষ্ঠী পারলৌকিক শান্তির জন্য যায়, আজ কোন শান্তি সৌদি আরব পৃথিবীকে উপহার দিচ্ছে? ইয়েমেনের বেশিরভাগ জনগোষ্ঠী তো মুসলমান, তারপরেও কেন সৌদি আরব এমন নির্মম আচরণ করছে? ব্যাপারগুলো পরিষ্কার হয়ে যায় একটি ঘটনার দিকে আলোকপাত করলে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্র্যাম্প যখন ক্ষমতায় এলেন, ঘোষণা দিয়েছিলেন যে ছয়টি মুসলিম দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু সেই ট্র্যাম্প প্রথম যে মুসলিম দেশটি সফর করলেন, সেটি হলো সৌদি আরব। কেন? কারণ আমেরিকার অস্ত্রের বাজারে আজ সৌদি আরব হলো সবচেয়ে বড় ক্রেতা। শুধু ইয়েমেনের যুদ্ধের সময়ই তারা আমেরিকার কাছ থেকে প্রায় ৮০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনেছে। এই বিপুল-বিশাল অস্ত্র বাণিজ্যের জন্য ক্রেতা-বিক্রেতা দুপক্ষের জন্যই এমন দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ প্রয়োজন। এগুলো থেকে খুব সহজেই বোঝা যায়, ইয়েমেনের উপর সৌদি আরবের নিপীড়ন, যুদ্ধবাজ মার্কিনী শাসকদের সাথে তাদের সম্পর্ক আসলে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য থেকে নয়, মুনাফা লোটার জন্য। ধর্ম তাদের লেবাস, আসল উদ্দেশ্য অস্ত্রের আধিপত্য চালিয়ে দেশে দেশে লুণ্ঠন-লুটপাট চালানো।

আরেকটি বিষয়ও এখানে উল্লেখ করতে হয়। মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হলো ইরান। ইয়েমেনের বর্তমান পরিস্থিতিতেও আমরা দেখব সেখানে হুতি গোষ্ঠীর সাথে ইরানের সম্পর্ক আছে। আবার এই হুতিদের দখলে এখন ইয়েমেনের একটি বড় অংশ। তাই সৌদি আরব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে- ইয়েমেন কার দখলে থাকবে? ইরান নাকি সৌদি আরবের? কেবলমাত্র এই হিসাব-নিকাশের জন্যই আজ ইসলাম ধর্মের ধ্বজাধারী সৌদি আরব বোমা বর্ষণ আর অবরোধ চাপিয়ে লক্ষ লক্ষ ইয়েমেনি মারার ব্যবস্থা করছে। জবর দখলের কাছে হেরে যাচ্ছে ধর্মীয় নৈতিকতা, মানবিকতা আর ভ্রাতৃত্ববোধ।

পুঁজিবাদী বিশ্বের এমন বিরোধের কারণেই সারা পৃথিবী বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য আজ হয়ে উঠেছে হিংসার অগ্নিকুণ্ড। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাহরাইন, ইয়েমেন, লেবানন, ইরাক, সিরিয়ায়। এসব যুদ্ধে প্রাণ যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ নিরীহ-নিরাপরাধ নাগরিকের। তৈরি হচ্ছে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির। রাজায় রাজায় যুদ্ধে প্রাণ বের হচ্ছে উলুখাগড়ার।

পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব অস্ত্র ব্যবসা ছাড়া টিকতে পারে না। অস্ত্র বিক্রির জন্য তারা শত্রু তৈরি করে, আঞ্চলিক-জাতিগত বিরোধ উস্কায়। এতে মানুষের কী হবে তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না। এ এমন এক অসহনীয় সময় যখন সত্যিকার অর্থে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো কোনো রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান নেই। বিশ্বব্যাপী তাই সাধারণ মানুষের করুণ পরিণতি। ইয়েমেনে লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরবে, তা সকলকে দেখতে হবে। এ অবস্থায় ভরসা কেবল দেশে দেশে সচেতন মানুষের যুদ্ধবিরোধী-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান। ইয়েমেনের আজকের যে পরিস্থিতি, তাতে যদি প্রত্যেকটি বিবেকবান নাগরিক এবং তাদের সক্রিয় প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে যদি বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে, তাহলেই কেবল এমন অসহনীয় পরিণতি থেকে মুক্তি মিলবে। আমরাও সেই ভূমিকা আমাদের দেশে পালন করতে চাই।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সমাজতন্ত্র হচ্ছে যে সাম্যবাদের প্রাথমিক পর্যায় এবং এর অগ্রসর নীতি হচ্ছে প্রত্যেকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজকে দেবে এবং সমাজ প্রত্যেককে তাদের প্রয়োজন অনুয়ায়ী দেবে। এটা বাস্তবায়নের জন্য উৎপাদন শক্তির উচ্চবিকাশ ও বস্তুগত সম্পত্তি প্রচুর থাকতে হয়। সুতরাং **সমাজতান্ত্রিক স্তরে মৌলিক কাজ হচ্ছে উৎপাদন শক্তির বিকাশ।... উৎপাদন শক্তির বিকাশের সাথে সাথে ক্রমাগত মানুষের বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত উন্নতি হতে থাকে।'** *(বোল্ড করা হয়েছে গুরুত্ব বোঝাতে)*

অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি দেঙ জিয়াও পেঙ চিন্তাধারা অনুযায়ী যেকোন ভাবে উৎপাদন শক্তির বিকাশ-ই নতুন যুগের সমাজতন্ত্রের ধারণা। কিন্তু এভাবে উৎপাদন বাড়ালে যে বিপদও হতে পারে – তার আলোচনায় নেই। এ সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, "সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত নিয়মকে বজায় রেখে – অর্থাৎ উৎপাদনের বিকাশের নিয়মকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঠিক ঠিকভাবে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় রূপান্তরের নিজস্ব কর্মসূচিটি বজায় রেখে – সমস্ত মানুষের শক্তিকে সংহত করে এবং উৎপাদনের উৎসগুলিকে – সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বস্তুগত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সমস্ত কিছু – একত্রিত করে এবং বিজ্ঞানের কারিগরি বিকাশকে তার সাথে যতদূর সম্ভব প্যাটার্ন করে – উৎপাদন বাড়াতে হবে। লেনিন যেহেতু বলে গেছেন, উৎপাদনের প্রাচুর্য ছাড়া সমাজতন্ত্র হতে পারে না, অতএব উৎপাদন যেভাবেই হোক বাড়াতে হবে – বিষয়টা এত সহজ নয়।" *(চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত মিলিটারি হস্তক্ষেপ, রাশিয়ায় সংশোধনবাদের বিকাশ ও পুঁজিবাদের বিপদ প্রসঙ্গে)*

তিনি আরও বলেছিলেন, 'উৎপাদনের প্রাচুর্যের দিক থেকে সোভিয়েট আমেরিকার নিচে এবং মোট উৎপাদন আমেরিকার থেকে কম থাকা সত্ত্বেও সারা দুনিয়াকে কমিউনিস্টরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে জয় করতে পেরেছিল এই কারণে যে, সমাজতন্ত্রের শক্তি ভিন্ন জায়গায় নি-হিত। সেটা শুধু উৎপাদন বাড়ানোর উপরে দাঁড়িয়ে নেই।' চেতনার নিম্নমানের জন্য এই বুনিয়াদি বিষয়টি সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব ধরতে পারেনি। একই কথা দেং জিয়াও পিং ও বলেছেন।

দেং-এর চিন্তা মতে, সমাজতান্ত্রিক স্তরে মৌলিক কাজ হচ্ছে উৎপাদন শক্তির বিকাশ। মনে হবে এটি যেন কোনো কারখানা ব্যবস্থাপকের মন্তব্য। সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন বাড়াতে হয়, কথা সত্য কিন্তু তা কোনো অবস্থাতেই মৌলিক কাজ হতে পারে না। শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দল যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকে তখন তাদের মৌলিক কাজ হচ্ছে সমাজঅভ্যন্তরে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে শ্রেণি বিলুপ্তির জন্য বস্তুগত ও ভাবগত সংগ্রাম পরিচালনা করা।

দেং-এর মতে, 'উৎপাদন শক্তির বিকাশের সাথে সাথে ক্রমাগত মানুষের বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত উন্নতি হতে থাকে'। এই ভাবনাটিও অত্যন্ত যান্ত্রিক। মার্কসবাদের ছাত্র হিসাবে এ কথা জানা থাকার কথা যে, উৎপাদন শক্তি বিকাশের সাথে সাথে মানুষের বস্তুগত ও ভাবগত উন্নতির সম্পর্ক যান্ত্রিক নয়, দ্বান্দ্বিক। এর সাথে রাষ্ট্রের চরিত্র, আদর্শ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধের চর্চাসহ আরও নানা বিষয় জড়িত। উৎপাদন বাড়লেই মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতি হতে থাকে এ কথা যে সত্য নয়, তা আজকের পুঁজিবাদী বিশ্বের দিকে নজর দিলেও বোঝা যাবে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নেও উৎপাদন বেড়েছিল, অর্থনৈতিক দিক থেকে জনগণের সকল অভাব পূরণ করার জায়গাতেও তারা গিয়েছিল কিন্তু পুঁজিবাদী নানা প্রবণতা তারা সমূলে উৎপাটন করতে পারেনি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পতনের এটা ছিল একটি অন্যতম প্রধান কারণ। সংস্কৃতির সংগ্রাম আরেক জাতের। কেবল উৎপাদন বাড়ালে জনগণের সংস্কৃতিগত মান উন্নত হয় না। এই কাজ না করে, জনগণের মধ্যে ব্যক্তিসম্পত্তি ও ব্যক্তি সম্পত্তিজাত মানসিকতাকে নির্মূল করার সংগ্রাম না করে বাস্তবে দেং জিয়াও পিং সমাজতন্ত্রের নামে এক ধরনের চালাকিই করেছেন।

শি জিং পিং এর 'চীনা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সমাজতন্ত্র' সম্পর্কিত চিন্তাধারা

১৯ তম কংগ্রেসে চীনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শি জিং পিং যে বক্তব্য রেখেছেন তার কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে আলোচনা করছি। শি'র বক্তব্যে দেঙ-এর চিন্তাধারারই ধারাবাহিকতা আমরা দেখতে পাব। পুরো রিপোর্টে চীনের উৎপাদন শক্তি বাড়ানোর ব্যাপাটি বারবার বলা হয়েছে। রিপোর্টে আগামী দিনের 'সমাজতান্ত্রিক চীন'র পরিকল্পনাও তুলে ধরা হয়েছে।

রিপোর্টের এক পর্যায়ে আঞ্চলিক উন্নতির কথা বলতে গিয়ে শি জিং পিং উল্লেখ করেছেন যে বেইজিং-এর একটি উচ্চভিলাষী পরিকল্পনা আছে যার নাম হলো 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড'। এই প্রকল্পের মাধ্যমে চীন 'সিল্ক রোড'কে পুনরুজ্জীবিত করতে চাচ্ছে। সারা বিশ্বের ৬৮টি দেশ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেও মূলত চীনের নেতৃত্বে এই প্রকল্প এগিয়ে যাচ্ছে। এর তিনটি ভাগ ১. চীনের জিয়ান অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে কাজাকিস্তান, সমরকন্দ, তেহরান, ইস্তাম্বুল, মস্কো হয়ে জার্মানির রোটেরডেম। এই রাস্তাটিকে বলা হচ্ছে 'সিল্ক রোড ইকনোমিক বেল্ট'। ২. দ্বিতীয় ভাগটি মেরিটাইম সিল্ক রোড নামে পরিচিত যেটি চীনের ফুযহৌ অঞ্চল থেকে শুরু করে কুয়ালালামপুর, জাকার্তা হয়ে কলকাতা, কলম্বো, জিম্বাবুইয়ের নাইরোবি, গ্রীসের এথেন্স হয়ে ইট-লির ভেনিসে গিয়ে শেষ হয়েছে। ৩. আর সর্বশেষটি হলো চীনের খাসঘর থেকে শুরু হয়ে পাকিস্তানের গদর অঞ্চল দিয়ে গিয়ে রুটটি শেষ হয়েছে।

এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে যাতায়াতের পথ তৈরি করার মাধ্যমে বাস্তবে চীন এই দেশগুলো থেকে বিশেষত অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ দেশসমূহ থেকে সস্তা কাঁচামাল, শ্রমশক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ আরোহন করতে চায়। এই পরিকল্পনা যদি তারা বাস্তবায়ন করতে পারে তবে আগামী দিনে তারা হবে এক নম্বর ধনী দেশ।

১৯৭৮ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অর্থনৈতিক সংস্কার করে। ১৯৮১ সাল থেকে চালু করে বাজার অর্থনীতি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আসার ফলে যে শক্তিশালী ভিত্তি চীনে গড়ে উঠেছিল, তাকে ব্যবহার করে চীনের বাজার বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারের পরিকল্পনা।

কিন্তু এটা কি সমাজতন্ত্র? পুঁজিবাদী বণ্টন ব্যবস্থার সাথে এর পার্থক্য কোথায়? চীন যদি বিশ্বের এক নম্বর ধনী দেশ হয় তাতে তার দেশের জনগণের কী লাভ? চীনে এখন প্রায় সাড়ে ৫ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে মানবেতর জীবনযাপন করে। যাদের মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ ১ ডলারেও কম। অন্যদিকে চীনে সবচেয়ে ধনী ৩ ব্যক্তির প্রত্যেকে কমপক্ষে ৩ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের সম্পদের মালিক।

তাহলে শি'র 'চীনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাজতন্ত্র' কথাটা মানে কী? আসলে তারা কৌশলে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকেই সমাজতন্ত্রের নতুন বৈশিষ্ট্য বলে চালিয়ে দিচ্ছে। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যকে 'বৈচিত্র্য' বলে জনগণের সাথে প্রতারণা করছে। পুঁজিবাদ যেভাবে তার সংকট মোকাবেলা করে, সেভাবে তারাও কেবল উৎপাদন বৃদ্ধিরই দাওয়াই দিচ্ছেন। আজকের চীনের শাসন মূলত একদলীয় শাসনের মাধ্যমে বিদেশি পুঁজি, রাষ্ট্রীয় পুঁজি, ব্যক্তি পুঁজির সম্মিলিত বিকাশের একটি সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ।

সমাজতন্ত্র নিয়ে এমন শোধনবাদী পদক্ষেপেরও পরও আমরা দেখলাম বাংলাদেশের একটি বামপন্থী পার্টি সিপিবি চীনের ১৯তম কংগ্রেস উপলক্ষে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালো। (সাপ্তাহিক একতা'র ২২ অক্টোবর '১৭ সংখ্যা) তারা বলেছেন, 'সিপিবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে কমরেড শি জিন পিং এর সুযোগ্য নেতৃত্বে চীনা পার্টি সফলভাবে এ কংগ্রেস সম্পন্ন করতে পারবে।... সিপিবি বিশ্বাস করে, সমাজতন্ত্রের গৌরবময় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য চীনা পার্টি তার রাজনৈতিক কর্তব্যসমূহ এগিয়ে নেবে।' আজকে সারা পৃথিবীতে চীনের কর্মকাণ্ড দেখেও, তাদের অর্থনৈতিক সংস্কার পর্যবেক্ষণ করেও সিপিবি'র এই মূল্যায়ন! এই চীন সমাজতন্ত্রের পক্ষে কী গৌরবময় ভূমিকা পালন করছে তা তাদের দেখাতে পারলে ভালো হত। অতি সম্প্রতি রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীনের ভূমিকা কি আমাদের অজানা? চীন তার নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়েই সমাজতান্ত্রিক – এ ব্যাপারটিরও ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬২ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে যে মতাদর্শগত বিরোধ তৈরি হয়েছিল, যাকে মহাবিতর্কও বলা হত, তখন সিপিবি'র (তৎকালীন ইপিসিপি) অবস্থান ছিল সোভিয়েতের পক্ষে। সেসময় তারা মাও সে তুং-এর নেতৃত্বাধীন চীনকে সংশোধনবাদী, হটকারী আখ্যাও দিয়েছিল। মাও সে তুং-এর চীন 'সংশোধনবাদী' আর আজকের শি চিং পিং-এর চীন 'সমাজতন্ত্রী'?

শি জিং পিং কেবল দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসেননি, তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন শক্তি বিকাশের নামে বাস্তবে ব্যক্তি পুঁজি বিকাশের সর্বোচ্চ সুযোগ করে দেবার পরিকল্পনা করছেন। এবারের কংগ্রেস সেই বার্তাই দিয়ে গেল। তাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে কমিউনিস্ট নামের পুঁজিবাদী দল বলতে আমাদের আর দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করে মনুষ্যত্বে

(১ম পৃষ্ঠার পর) সাম্য আর মৈত্রী। কিন্তু স্বাধীনতা এসেছিল ধনীদের জন্য। সেই ফরাসি দেশেই ১৮৭১ সালে আরেকটি অভ্যুত্থান হয়েছিল, যার নাম ছিল প্যারি কমিউন। তাতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছিল। তারপরে ১৯১৭ সালে এই সমস্ত বিপ্লবকে পাথেয় করে এবং নতুন জ্ঞানের সঞ্চার ঘটিয়ে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে যে বিপ্লব হয়েছিল তা পৃথিবীকে বদলে দিয়েছে। এটি কেবল একটি দেশের বিপ্লব ছিল না, এই বিপ্লব ছিল সমস্ত বিশ্বের মানুষের জন্যে। এমন একটা রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যারা বলতে পেরেছিল যে – আমাদের এখানে কোনো মানুষ অভুক্ত থাকে না, বলতে পেরেছিল এখানে নিরক্ষর কেউ নেই, বলতে পেরেছিল এখানে আবাসনের কোনো সমস্যা নেই, বলতে পেরেছিল এখানে গণিকাবৃত্তি নেই। তারপর থেকে এই সমাজ ছড়িয়ে গেছে পূর্ব ইউরোপে, চীনে, কিউবায়, ভিয়েতনামে। ৭২ বছর টিকে ছিল সেই সমাজ।

প্রশ্ন উঠবে – এই ব্যবস্থা যদি এতই ভালো হবে তাহলে এর পতন হলো কেন? আসলে সমাজতন্ত্রের পতন হয়নি, পতন হয়েছে কতগুলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। আপনারা জানেন, পুঁজিবাদী বিশ্ব অবরোধ সৃষ্টি করেছিল। তারা সমস্ত অপকৌশল প্রয়োগ করেছে, অপপ্রচার করেছে এবং ওই রাষ্ট্রের ভেতরেও একটা আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল, যারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে তৎপর ছিল। দেশের বাইরের আক্রমণ এবং দেশের ভেতরে এই অবস্থার কারণে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন হয়েছিল। সমাজতন্ত্র না থাকার পরিণতি রাশিয়াতে কী হয়েছে? বেকার সমস্যা চলে এসেছে, গণিকাবৃত্তি চলে এসেছে এবং ছদ্মবেশে জারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পুঁজিবাদ আজকে পতনের জায়গায় চলে এসেছে। সমাজতন্ত্র এসেছিল ঐতিহাসিক কারণে ও বৈজ্ঞানিক নিয়মে। ঐতিহাসিক কারণটা হলো এই – পৃথিবীতে একদিন দাস ব্যবস্থা ছিল, তারপর সামন্তব্যবস্থা এসেছে, এরপর পুঁজিবাদ এসেছে। পুঁজিবাদ ইতিহাসের শেষ কথা হতে পারে না। ইতিহাস এগুবে, ইতিহাস পুঁজিবাদী পথে এগুবে না। ইতিহাস পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে এগুবে। এর কারণ হলো বৈজ্ঞানিক। কারণটি হলো এই যে আমরা দাস ব্যবস্থা, সামন্ত ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দেখছি, এদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। কিন্তু এদের মধ্যে যে মিল আছে তা হলো এ প্রত্যেকটি ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সমাজতন্ত্র উল্টো কথা বলে। সমাজতন্ত্র সামাজিক মালিকানায় বিশ্বাস করে। কাজেই অন্য ব্যবস্থায় শতকরা পাঁচজন সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং ৯৫ জন বঞ্চিত হবে। অথচ এই ৯৫ জনের শ্রমেই সভ্যতা চলবে, আধুনিকতা চলবে। কাজেই সেই ব্যবস্থা টিকতে পারে না।

আজকে সারাবিশ্বে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সারা বিশ্বের ৯৫ ভাগ মানুষ সমাজতন্ত্রের পক্ষে আর পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। আমরা দেখছি, পুঁজিবাদের ভেতরের দ্বন্দ্বগুলো বেড়িয়ে আসছে এবং পুঁজিবাদ আজ তার শেষ অবস্থা ফ্যাসিবাদে রূপ নিয়েছে। আজ তার সমস্ত মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গেছে। এই ব্যবস্থা পৃথিবীকে উত্তপ্ত করছে, প্রকৃতিকে উত্তপ্ত করছে, মানুষের সভ্যতাকে বিপন্ন করছে। যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করছে। দুটো বিশ্বযুদ্ধ পুঁজিবাদ বাধিয়েছে। বিবাদ বাধিয়ে অস্ত্র বিক্রি করছে বিবাদমান দুই পক্ষের কাছেই। কাজেই পুঁজিবাদের হাতে এখন মানুষের সভ্যতা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। মানুষ তাই বিক্ষুব্ধ। এই ব্যবস্থা তারা ভাঙবে। সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান তাই অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য।

সমাজতন্ত্রের সাথে পুঁজিবাদের পার্থক্য হলো মৌলিক। পুঁজিবাদ বিশ্বাস করে মুনাফায়, সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করে মনুষ্যত্বে। পুঁজিবাদের আগ্রসন তাই মনুষ্যত্বের উপর আগ্রাসন। সেই জন্য এই মুনাফারূপী পুঁজিবাদের পতন অপরিহার্য। আমরা যদি পুঁজিবাদের নৃশংস রূপ দেখতে চাই, তাহলে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর যে গণহত্যা চলছে, সেই দিকে তাকাব। এই গণহত্যা মুনাফার জন্য। একটা জনগোষ্ঠীকে একেবারে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এই গণহত্যায় চীন সমর্থন দিচ্ছে। আমরা দেখছি গণহত্যার সবচেয়ে নির্মম যে অস্ত্র গণধর্ষণ, তা আজ সামরিক জান্তারা চালাচ্ছে রোহিঙ্গাদের উপর। এই গণধর্ষণ আমরা দেখেছি একাত্তর সালে। পাকিস্তানি হানাদাররা কেমন করে আমাদের মা, মেয়ে, বোনদের গণধর্ষণ করেছে। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশেও এই গণধর্ষণ চলছে। বাঙালিরা এই কাজ করছে। সবচেয়ে অকল্পনীয় যে ঘটনা শিশুরা ধর্ষিত হচ্ছে। নানা তার নাতনিকে ধর্ষণ করছে। এমন কাজ পাকিস্তানের হানাদাররাও করেনি। আজকের বাংলাদেশে সেই জিনিস আমরা দেখছি। দেখছি পুঁজিবাদ কত নির্মম কত বর্বর হতে পারে।

আপনারা অনেকেই জেনে থাকবেন ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সেটি 'তেতাল্লিশের মন্বন্তর'। সেই মন্বন্তরে ৩০ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। আমাদের নিজের গ্রামে একজন মানুষ আত্মহত্যা করেছিল। সেই মানুষটা বেকার ছিল, তাকে সহযোগিতা করার কেউ ছিল না। আমি শৈশবে সেই দৃশ্য দেখেছি। সেই স্মৃতি আমাকে অনেকদিন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। সেই একই গ্রামে ৭৩ বছর পরে কিছুদিন আগে আরেকটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। সেখানে একজন নয়, একটা পরিবার-বাবা, মা, মেয়ে সবাই আত্মহত্যা করেছে। সেই একই কারণে। অভাবের কারণে। ওই তেতাল্লিশের পর আমরা ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দিয়েছি, আমরা পাকিস্তানিদের তাড়িয়ে দিয়েছি, আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ দেখছি। দেখছি একজনের জায়গায় তিনজন মারা যাচ্ছে।

উন্নতি হচ্ছে। উন্নতি গর্জন করছে। কিন্তু এই উন্নতির পিছনে এমন আত্মহত্যার গল্প আছে। যত উন্নতি হচ্ছে, তত বৈষম্য বাড়ছে। কারণ হচ্ছে এদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলাম, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল, মানুষ জেগে উঠেছিল। একাত্তরের যুদ্ধ হয়েছিল সমাজতন্ত্রের জন্য। এ কারণে জাতীয়তাবাদীরাও সংবিধানে সমাজতন্ত্রের স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হয়নি বলে পুঁজিবাদ অবমুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের যে স্বাধীনতা তাতে পুজিবাদের জয় হয়েছে। এ কারণে এখানে ধনী আরও ধনী হয়েছে, গরীব আরও গরীব হয়েছে। হত্যা, খুন, ধর্ষণ এসমস্ত কিছু বেড়েছে। সমাজতন্ত্র এর বিরুদ্ধে কথা বলে।

এই রুশ বিপ্লব, এর প্রতীক হচ্ছে কাস্তে-হাতুড়ি। কাস্তে-হাতুড়ি বোমা নয়, কাস্তে-হাতুড়ি কামান নয়, কাস্তে-হাতুড়ি হচ্ছে শ্রমের প্রতীক, সৃজনশীলতার প্রতীক। যে মেহনতী মানুষরা সভ্যতার চাকা চালায়, যারা উৎপাদন করে, তারা ওই কাস্তের সাহায্যে উৎপাদন করে, হাতুড়ির সাহায্যে উৎপাদন করে। এটি তাদের শ্রমের প্রতীক। রুশ বিপ্লব তাদের কথা বলে।

রুশ বিপ্লব থেকে যে শিক্ষা আমরা পাই তা হলো – প্রথমত, বিপ্লবে কোনো আপোসের জায়গা নেই। দ্বিতীয়ত হলো, বিপ্লবীদের ঐক্য প্রয়োজন। তৃতীয়ত, বিপ্লবীদের জ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োজন। এই জ্ঞানের কথাটা যেন আমরা না ভুলি। আমাদের স্মরণ করতে হবে যে মার্কসের সময়ে মার্কসের মতো অমন দার্শনিক পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি ছিলেন না। স্মরণ করতে হবে, লেনিন যখন বিপ্লব করেছিলেন, তখন তাঁর মতো বিপ্লবী পৃথিবীতে আর একজনও ছিল না। কাজেই তেমন জ্ঞানের চর্চা করতে হবে। আরেকটি কথা, বিপ্লব মানে সংস্কার নয়। বিপ্লব মানে সংশোধন নয়। বিপ্লবের মুহূর্তে লেনিন লিখেছিলেন 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'। তিনি বলেছিলেন, পুরোনো রাষ্ট্রকে আমরা যদি চূর্ণ-বিচূর্ণ না করতে পারি, তাহলে বিপ্লব হবে না।

সোভিয়েতে যে বিপ্লব হয়েছিল তাতে ক্ষমতা কোনো পার্টির কাছে যায়নি, গেছে জনগণের কাছে। আজকে যে শতবর্ষ আমরা উদ্‌যাপন করছি তার ভেতর রয়েছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ডাক। সমাজতন্ত্র অর্থাৎ সামাজিক মালিকানা। আমরা সেই ডাকে কীভাবে সাড়া দেব তার উপর নির্ভর করছে আমাদের দেশের বিপ্লবের ভবিষ্যৎ। এ কথা বলে, আপনাদের পুনরায় শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

বিপ্লব করতে হলে তিনটি শর্ত আমাদের পূরণ করতে হবে

(১ম পৃষ্ঠার পর) হলো একটি পুঁজিবাদী দেশ। দেশের সমস্ত কিছু পুঁজিবাদের নিয়মে চলছে। চলছে জবরদস্তি আর অন্যায় শাসন। আমরা যত গণতান্ত্রিক আন্দোলন এদেশের মাটিতে করতে চাই, তা যদি পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন না হয়, তবে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। ফলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনও আসবে না। কিন্তু আমরা যারা লড়াই করছি তারা সকলে, এ দেশটা যে পুঁজিবাদী, সে ব্যাপারে একমত নই। একারণে এখানে একটা গণআন্দোলন আমরা গড়ে তুলতে পারছি না। এতবড় সমাবেশ আমরা করতে পারি, কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে গণআন্দোলন আমরা গড়ে তুলতে পারি না।

দেশের নানা সংকট নিয়ে আমাদের লড়তে হচ্ছে। এই লড়াইটাকে আমাদের এমন স্তরে তুলতে হবে, যখন আমরা একটা সত্যিকারের বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটাতে পারব। এই বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটাতে হলে তিনটি আবশ্যকীয় শর্ত আমাদের পূরণ করতে হবে। প্রথমত, একটি সঠিক আদর্শ ও রাজনীতির ভিত্তিতে একটি বিপ্লবী পার্টি আমাদের গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে সর্বোচ্চ বোঝাপড়া ও সর্বনিম্ন কর্মসূচির ভিত্তিতে একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমাদের করতে হবে। এটা হলো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর্যায়। এই আন্দোলন করতে করতে সর্বহারা ও আধা-সর্বহারাদের নিয়ে গড়ে তুলতে হবে যুক্তফ্রন্ট। যাকে বলা হয় প্রলেতারিয়ান ইউনাইটেড ফ্রন্ট বা সর্বহারা যুক্তফ্রন্ট। তৃতীয়ত, সংযুক্ত ও সম্মিলিত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে জনগণের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার বা জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে হবে। এটা অনেকটা রাশিয়ায় যেমন সোভিয়েত গড়ে উঠেছিল, যেটি ছিল শ্রমিক-কৃষকের, তেমনভাবে জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি এদেশেও গড়ে তুলতে হবে। তারা এমনভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার শক্তি অর্জন করবে যাতে কখনো এগুতে পারে, পিছুতে পারে। এই তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয়কে সামনে রেখে যদি আমরা লড়াই করতে পারি, জনগণকে সংগঠিত করতে পারি, তবে এদেশের মাটিতে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবীরূপে আসবে। এই পথেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

আরেকটি কথা বলি। বিপ্লব আর বিদ্রোহ-বিক্ষোভ এক জিনিস নয়। বিপ্লব হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সঠিক আদর্শ ও বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে জনগণের সংঘবদ্ধ, সচেতন ও সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান। এই শর্ত পূরণ করার জন্য বাংলাদেশের জনগণ যত এগিয়ে যাবেন ততই আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে দেখা দেবে। এর মাধ্যমে নভেম্বর বিপ্লবের সার্থকতা আমাদের জীবনে বর্তাবে। এ কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলাম।

নভেম্বর বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ দীর্ঘজীবী হোক।
দুনিয়ার মজদুর এক হও।

(গত ৭ নভেম্বর শহীদ মিনারের মহাসমাবেশে 'অক্টোবর বিপ্লব শতবর্ষ উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি'র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও বাসদ (মার্কসবাদী) এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী যে বক্তব্য রাখেন তা সামান্য সম্পাদনাসহ ছাপানো হলো)

তিনটি মৃত্যু – একটি খবর

আব্দুল মোমিন মারা গেলেন। সাথে মারা গেল তার নয় বছরের কন্যা সানজিদা আর তার স্ত্রী লুবনা বেগম। কোনো এক সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে তারা আর ঘরে ফেরেননি। তাদের লাশ পাওয়া গেছে বাড়ির কাছাকাছি একটি জমির মধ্যে। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন তারা তিনজনে।

ঘটনার কারণ হিসেবে তার প্রতিবেশীরা চরম দারিদ্র্যের কথাই বলেছেন। সদ্য মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় গৌরবে মাথা উঁকি দেয়া একটি দেশের মুন্সিগঞ্জ নামক জেলায় আব্দুল মোমিন বাস করতেন। জীবন ধারণের জন্য করতেন মাছের ব্যবসা। কিন্তু ভালো চলছিল না তার। ভালো চলছে না তার মতো অনেকেরই। প্রচুর লোক-সান গুণে সংসার চালানোর জন্য শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছেন এবং সেখানেও বিপর্যস্ত হয়ে বারবার তাগাদা খেয়ে দিশেহারা হয়েছেন। অন্তিম দিশা তিনি পেয়ে গেলেন।

মারা যাওয়ার সময় আব্দুল মোমিন হয়তো জানতেন না তার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটছে। জিডিপি বৃদ্ধির হার এখন ৭.১%। মাথাপিছু আয় এখন বছরে এক লক্ষ আঠার হাজার ছয়শত পয়শট্টি টাকা। মাসে প্রায় দশ হাজার টাকা। কাগজে কলমে সবাই প্রতিমাসে এই টাকা আয় করে। দেশে শিল্পায়ন হচ্ছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে। এতসব তথ্য জানলে হয়তো তিনি সুখে মরতে পারতেন!

কিন্তু মরতে তাকে হতোই। কারণ আরেকটা পরিসংখ্যানও তাকে শুনতে হতো। সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে ধনী-গরীব বৈষম্য বাড়ছে ব্যাপকভাবে। গিনি কো-এফিসিয়েন্ট দিয়ে একটি দেশের ধনী-গরীবের বৈষম্যের মাত্রা বোঝা যায়। ২০১৪ সালে বাংলাদেশের এই সূচক ছিল ০.৩১, ২০১৬ সালে এসে হলো ০.৩৯। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এএফও) এর প্রতিবেদনে বৈষম্যের হার বৃদ্ধিতে গোটা এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। এই কারণে মাথাপিছু আয়ের হিসেবে আব্দুল কাদিরের টাকাটা তার পকেটে আসেনি। তার টাকাটা অন্য কারও সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।

`Freedom of choice' বা পছন্দের স্বাধীনতার কথা আমরা অহরহ শুনতে পাই। দারিদ্র্য কেউই পছন্দ করে না। কিন্তু দারিদ্র্যকে তার মেনে নিতে হয়। মেনে নিতে হয় কারণ এই ব্যবস্থার কাছে সে অসহায়, যদি না ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সে লড়াই করে। আব্দুল মোমিনের মতো লক্ষ কোটি লোক আছেন এই দেশে। তারা কেউই দারিদ্র্যকে পছন্দ করে আনেননি। বরং চরম দারিদ্র্য তাদের উপর চেপে বসেছে এবং একসময় একেবারে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এমন হয় কেন? কারণ এই সমাজব্যবস্থাটা পুঁজিবাদী। গুটিকয়েক পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফা লোটার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত এখানে। দিনশেষে এখানে জিডি-পি'র হিসেব শোনানো হয়। কিন্তু তা কার পকেটে ঢুকে, সেকথা গোপন থাকে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক দিনরাত খেটে যে পণ্য তৈরি করে তার মূল্যের বেশিরভাগটাই ঢোকে মালিকশ্রেণির পকেটে। শুধু শ্রম দেয়ার জন্য বেঁচে থাকতে যতটুকু দরকার, ততটুকুই পায় শ্রমিকরা। কখনও তাও পায় না। সারাদেশে লক্ষ লক্ষ বেকার। তারা সামান্য কিছু টাকা পেলেই নিজের শ্রম বিক্রি করবে, কিন্তু তাও সে পাচ্ছে না। ছোট ব্যবসায়ীরা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে বাজার থেকে। গরীব কৃষক জমি বিক্রি করে দিয়ে বিছানা পাতছে ঢাকার রাস্তায়। এ চিত্র তো অহরহ। কাদিরের পরিবারের তিনজনই আত্মহত্যা করেছিল, তাই ব্যাপারটা খবর হয়েছে। হাজার হাজার প্রাণ প্রতিদিন নিরবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে – সে খবর এত কোলাহল পেরিয়ে আসে না।

এই ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে অনেক আগেই সর্বহারার মহান নেতা ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস বলেছিলেন, " . . . একজন ব্যক্তি যখন একথা জেনেই অপরকে আঘাত করে যে, তার আঘাত মৃত্যুর কারণ হবে, তখন তার কাজকে আমরা বলি হত্যা। সমাজ যখন হাজার হাজার মানুষকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো থেকে বঞ্চিত করে, বাঁচার অযোগ্য অবস্থার মধ্যে তাদের রেখে দেয়- আইনের বেড়ি পড়িয়ে নিশ্চিত মৃত্যু পর্যন্ত ওই অবস্থায় থাকতেই তাদের বাধ্য করে, সহস্র জীবনের ধ্বংস অনিবার্য জেনেও সমাজ যখন ওই অবস্থাই চলতে দেয়; তখন একজন হত্যাকারীর মতোই সমাজের এই কাজটিও মানবহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। . . . . "

একটা জীবন খুব ছোট কোন কথা নয়। অনেক স্বপ্ন, অনেক সাধের এ জীবন। মানুষ এ জীবন পায় মাত্র একটিবার। এইভাবে পরাজিত হয়ে নিজেকে হত্যা করতে কেউই চায় না। হয়তো কত স্বপ্ন নিয়ে আব্দুল মোমিন তার জীবন শুরু করেছিল। কিন্তু হল না কিছুই। আমাদের কাছে এই মৃত্যু একটা খবর মাত্র, কিন্তু তার কাছে . . . 'একটা গোটা জীবন।'

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস
কী বার্তা দিয়ে গেল?

গত ২৪ অক্টোবর শেষ হয়েছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) ১৯তম কংগ্রেস। এতে শি জিন পিং পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। এই কংগ্রেসে চীনা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরো স্ট্যান্ডিং কমিটিও নির্বাচিত হয়েছে। চীনের এই কংগ্রেসকে স্বাগত জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি।

সিপিসি নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে দাবি করে। শুধু দাবি করে বললে অপর্যাপ্ত হবে, সমাজতন্ত্র নিয়ে তারা নতুন ব্যাখ্যাও দিচ্ছে। বলছে নতুন যুগের সমাজতন্ত্র, 'চীনা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সমাজতন্ত্র'। এ প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার বিষয় – আসলে 'সমাজতন্ত্র' বলতে সিপিসি কী বোঝাচ্ছে? কংগ্রেস থেকে ভবিষ্যতের কোন বার্তা দিচ্ছে তারা? যে চীনকে দেখে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির এত উচ্ছ্বাস, তারও বা যৌক্তিকতা কতটুকু?

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদনের উপর যে রেজুলেশন গৃহীত হয়েছে তা এমন - 'এই কংগ্রেস চীনা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্রের পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, মাও সে তুং এর চিন্তাধারা, দেং জিয়াও পিং-এর তত্ত্ব এবং নতুন যুগে চীনা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সি জিং পিং এর চিন্তাধারা দিয়ে পরিচালিত।' *(সূত্র :http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/24/c_136702625.htm)* মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কিংবা মাও সে তুং এর চিন্তাধারা একটি বহু আলোচিত বিষয়। এই চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে আজও বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের লড়াই পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু দেং জিয়াও পিং এর তত্ত্ব কিংবা সি জিং পিং এর চিন্তাধারা সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ?

দেং জিয়াও পিং এর তত্ত্ব

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'পিপলস ডেইলি'তে ১৯৮৪ সালে, যখন দেং জিয়াও পিং ক্ষমতায় তখনই Building Socialism with a Specifically Chinese Character প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল, 'সমাজতন্ত্র কী আর মার্কসবাদ কী? অতীতে এই বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা ছিল না। মার্কসবাদ উৎপাদন শক্তি বিকাশের বিষয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। আমরা বলেছি *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ইয়েমেনে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির জন্য পুঁজিবাদী বিশ্বের মোড়লরা দায়ী

না খেয়ে, বিনা চিকিৎসায়, ধুঁকে ধুঁকে মারা যাবার তীব্র কষ্টের ছবি আবারও দেখতে হবে দুনিয়ার মানুষকে। মানুষ যে এভাবে আজও-এখনও মরছে না, তা নয়। কিন্তু আমরা যে ঘটনাটির কথা বলছি, তাতে মৃত্যু আসন্ন মানুষের সংখ্যা হবে প্রায় ৭০ লক্ষ! ভাবা যায়? সভ্যতার এমন দুঃসহ কলঙ্কের জন্ম হতে যাচ্ছে আরব অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ইয়েমেনে। একসময়ের সমৃদ্ধশালী দেশ ইয়েমেন আজ দুর্ভিক্ষে পতিত, যুদ্ধে বিপর্যস্ত। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে দেশটির মানুষ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, জনগণ পরিণত হয়েছে দেশি-বিদেশি শাসকের হিংস্র খেলার পুতুলে। চারপাশ ঘিরে আছে আরব বিশ্বের মোড়ল সৌদি আরব। এই সৌদি আরবই ইয়েমেনের দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি তৈরি করার প্রধান কুশীলব।

গত ২০১৫ সালের মার্চ মাস থেকে ইয়েমেনে চলছে সৌদি আগ্রাসন। ইতিমধ্যে প্রায় ১০ হাজার বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারিয়াছে। গত আড়াই বছরে সৌদি আরবের উপর্যুপরি

বোমা বর্ষণে ইয়েমেনে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে, জ্বালানি তেলের মূল্য হয়েছে আকাশচুম্বি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। সৌদিদের বোমা হামলার লক্ষ্য এখন হাসপাতাল। ফলে চি-কিৎসা নিতেও মানুষ মরছে। কলেরা ব্যাপক সংক্রমণে মৃত্যুর হার বাড়ছে হু হু করে।

এই আক্রমণ আরও তীব্র হয়েছে গত ৪ নভেম্বরের ঘটনায়। সৌদি আরব অভিযোগ করেছে তাদের রাজধানী রিয়াদের একটি বিমানবন্দরের কাছে ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুতি বোমা বর্ষণ করেছে। এর পিছনে ইরানের হাত রয়েছে – এই অভিযোগ তুলে সৌদি আরব এখন কেবল বোমা বর্ষণ নয়, ইয়েমেনের স্থল-নৌ-বিমান বন্দরের সীমানাতে অবরোধ আরোপ করেছে। ঢুকতে দিচ্ছে না বাইরে থেকে আসা কোনো সাহায্য। এমনকি জাতিসংঘের 'মানবিক সাহায্য সংস্থার' খাদ্য সহযোগিতাও তারা আটকে দিয়েছে।

এর ফলে অবস্থা কতটা ভয়াবহ হতে পারে তার কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায় জাতিসংঘের 'মানবিক সাহায্য সংস্থা'র প্রধান জেনারেল লোককের মন্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন, 'এই দুর্ভিক্ষ দক্ষিণ সুদানের মতো হবে না যেটি আমরা এ বছরের শুরুতে দেখেছি। এমনকি ২০১১ সালে সোমালিয়ার দুর্ভিক্ষের মতোও হবে না, যেখানে প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ হবে বহু দশকের মধ্যে ভয়াবহতম।' জাতিসংঘ আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে যে, দ্রুত খাদ্য, পানীয় ও ওষুধ (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org